IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

তসলিমা নাসরিনের কবিতার ভাষা

ইমরান সেখ, গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যে বেগম রোকেয়া যে নারীবাদের চর্চা করে পুরুষতন্ত্রকে কটাক্ষ করেছিলেন, তাচ্ছিল্য করছিলেন, তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যে তাই-ই পরিলক্ষিত, তবে তা আরও তীব্র ক্রোধে উচ্চারণ করেছেন তসলিমা। সাহিত্যের আসরে কবিতা দিয়ে তাঁর পথচলা শুরু হলে ক্রমে তিনি বিতর্কিত হয়ে যান একশ্রেণীর পাঠকের কাছে। সরল ও সাবলীল ভাষায় রচিত তাঁর কাব্যগুলির বিষয় হয়ে ওঠে পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসন ও ধর্মীয় মৌলবাদ। তাঁর সাহিত্যে ক্রমশ জায়গা পেতে থাকে প্রান্তিক মানুষেরা, তৃতীয় লিঙ্গ ও নারীর সমানাধিকার বিষয়ক রচনা। তিনি লক্ষ্য করেছেন পুরুষতন্ত্র চায় নারীবাদকে বিকলাঙ্গ করতে, এখানে তাদের সহায়ক হয়ে ওঠে ধর্ম গ্রন্থগুলি। যে যৌনতা দিয়ে পুরুষতন্ত্র নারীর কণ্ঠরোধ করেছিল, সেই যৌনতার হাত ধরেই নারীর মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। একদিকে নিজের দেহকে গুরুত্ব দেওয়া, অন্যদিকে যৌনতার প্রশ্নে পুরুষের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠার মাধ্যমে নারীবাদী মুক্তিচেতনার বিস্তারের কথা আছে তাঁর কাব্যগুলির পরতে পরতে। কবিতার আঙ্গিক গঠনে প্রাধান্য পেয়েছে মোখিক কথন রীতি; কবিতার পংক্তিগুলি যেন গদ্যে বলে যাওয়া কথার সারি। এই পংক্তিগুলির বাচন ভঙ্গিতে দু'টি ক্রম লক্ষ্য করা যায় – এক, জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রতিবাদ চেতনামূলক ভাষা। দুই, সামাজিক বৈষম্যের দাবিতে নারীবাদী দৃষ্টিতে রচিত শব্দের ব্যবহার। এছাড়া কবিতার ভাষা গঠনে আর একটি বিষয় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে তা হল পদ ব্যবহারের রীতি। তসলিমার অধিকাংশ কবিতার ক্রিয়াপদ লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের বক্তব্য বিষয়ের যাত্রা ভবিষ্যত কালের দিকে। শৈলীগত দিক দিয়ে কবিতা গুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে সমান্তরালতা, বৈপরীত্য ও চিত্রকল্পের ব্যবহার। নিছক পদ বা পদগুচ্ছের পুনরুক্তি নয়, বক্তব্য বিষয়কে প্রাধান্য দিতে কবিতাগুলিতে বিস্তার লাভ করেছে সমান্তরালতা, অনেক ক্ষেত্রে কবিতার নামের মধ্যেই রয়েছে কবিতার key-phrase বা key-word যা বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে নিয়ে আসে সমান্তরাল গঠন। আর বৈপরীত্য প্রয়োগ তসলিমার কবিতায় একটি অতি ব্যবহৃত রীতি যা কবিতার গঠন ও অর্থের মধ্যে টানাপোড়েনের সৃষ্টি করেছে। সর্বোপরি, চিত্রকল্পের ব্যবহারে নারী জীবনের সার্বিক জীবন যন্ত্রণার ইমেজকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন কবি। কাব্যিক সুষমা নয়, তিনি দৈনন্দিন জীবন থেকে এমন সব শব্দ নির্বাচিত করেছেন যা স্তবকের পর স্তবকজুড়ে ছবির মতো নির্মাণ হয়ে উঠেছে।

সূচক শব্দঃ নারীবাদ, পুরুষতান্ত্রিকতা, কবিতার গঠন, মোখিক কথন, চিত্রকল্প

মূল প্রবন্ধঃ প্রাচীন কাল থেকে আজ অব্দি বিশ্বে নারী নির্যাতিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত। বর্তমান সময়েও এই ধারা অব্যাহত। আমাদের প্রচলিত সংস্কারগুলি নারী নির্যাতনের পাথেয় হয়ে উঠেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ও সংস্কৃতিতে পুরুষই পূর্ণাঙ্গ মানুষের সংজ্ঞা পায়, নারী সেখানে অর্ধমানব। সমস্ত ধর্মগুরু পিতৃতন্ত্রের ধ্বজা-বাহক বলে পুরুষের তৈরি শাস্ত্র নারীকে করেছে হেয়, পরিত্যাজ্য। যুগ-যুগ ধরে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো নারীকে শোষণ ও নির্যাতনের শিকার বানিয়ে তাকে বঞ্চিত করে রাখতে চেয়েছে চার দেওয়ালের মধ্যে। আঠেরো শতকের পাশ্চাত্যে ক্রমে এই বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত নারী প্রচলিত পরিকাঠামোকে ভেঙে নতুন মৌলিক ভাবনার সাথে অবির্ভাব ঘটিয়েছিল নারী আন্দোলনের। নারীর নিজস্ব সত্ত্বা খুঁজে পাওয়ার জন্য নারী-মুক্তির এই লড়াই কখনও পথে এনে দিয়েছে বিক্ষোভ, আবার কখনও তা হয়েছে বিপ্লবী বীরত্বের স্বাক্ষর। এই পাওয়া, না পাওয়া, হারানো ও বেদনার আত্মকথাই ধাপে ধাপে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে নারী উত্তরণের, নারী আন্দোলনের আখ্যানকে। আর বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাব আছড়ে পড়ল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। উনিশ শতকের শেষ দশকে নারীমুক্তির অর্থাৎ নারীর নিজস্বতা সন্ধানের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে নারী চেতনাবাদ গিয়ে পৌঁছেছিল গভীর ও ব্যাপক পর্যায়ে। লিঙ্গগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ যথেষ্ট নয়, নারীর যাবতীয় শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতা সাহিত্যিক অভিব্যাক্তির দাবি করেছে। ইতিপূর্বে বাংলায় ঘটে গেছে সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহের মতো প্রভৃতি সামাজিক আন্দোলন যেখানে পুরুষেরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। নারীর মূল্য ও প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা সমাজের বুকে গভীর আলোড়ন তুলেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ শতকের প্রথম দিকে নারীজাগরণের অভিঘাতে মেয়ে-কবি হয়ে ওঠার অস্‌ফুট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মেয়েদের মধ্যে। এই সময়পর্বে খুব বেশি মহিলা কবিদের আমরা পাই না, বিশেষ করে সার্থক মহিলা কবি যারা; তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হল সত্তরের দশক পর্যন্ত। আর বর্তমান সময়ে নারীবাদী সাহিত্যিকদের যে প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হল ভাষার সঙ্গে নারীবাদের সম্পর্কটি - এর কারণ ঐতিহাসিক। কারণ, প্রথম থেকেই সাহিত্য ছিল পুরুষদের জন্য পুরুষদেরদের দ্বারা রচিত।

মেয়েদের লিখিত সাহিত্যের ভাষা বৈশিষ্ট্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিকবার তাঁর গল্পে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর 'দর্পহরণ' গল্পে গল্পলেখার প্রতিযোগিতায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যোগ দেয়, কিন্তু পুরষ্কার পায় স্ত্রী। সেই গল্প যদিও চলিত ভাষায়। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পেও আমরা দেখি অমলের লেখায় কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ লেখার ধরণকে লেখক পরিহাস করে চারুলতার লেখার অকৃত্রিমতাকেই প্রশংসা করেছেন।[১] যদিও এই গল্পেও আমরা দেখি শুরুর দিকে চারুলতা আমলকেই অনুকরণ করেছিল। সামগ্রিকভাবে আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের দিকে দেখি তাহলে সেখানেও আমরা দেখতে পাব মেয়েরা সাহিত্যের আসরে নেমে পুরুষদেরকেই অনুকরণ করেছিল। এইসময়ে সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি পাওয়া নয়, তাদের জীবন-পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানানোই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই কাল-পরিসরের ভাষা ছিল একান্তই মেয়েদের।

লিখিত সাহিত্যের পূর্বে মেয়েদের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র ছিল মোখিক পরম্পরা; ছড়া, রূপকথা, প্রবচন, ব্রতকথা, গীতিকা, কিংবদন্তি প্রভৃতি। মৌখিক পরম্পরা ছিল মেয়েদের দ্বারাই রচিত ও তাদের আত্মপ্রকাশের ভাষা। ক্রমে মেয়েদের বক্তব্য বিষয় ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলে লাগল। ফলে যেখানেই মেয়েদের ব্যক্তিত্ব খর্ব হয়েছে সেখানেই তাদের ভাষা তীব্র রূপ পেয়েছে তাদের লেখনীতে। অধ্যাপিকা ঋতু সেন চৌধুরী 'নারীবাদের নানাপাঠ' গ্রন্থের ভূমিকায় এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে,

> "প্রাধান্য বিস্তারের একটি আকর হল ভাষা। লিঙ্গ (অথবা শ্রেণি, ধর্ম, জাত, বর্ণ) – ভিত্তিক কর্তৃত্ব যেমন একভাবে তৈরি হয় তেমনি টিকেও থাকে ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। সমাজে যা ঘটছে যেভাবে ঘটছে তা-ই নিয়েই ভাষার নির্মাণ। দৈনন্দিন কথা বার্তা অনায়সে সমাজের প্রভাবশালী মতাদর্শ – নীতি নিয়ম, ঠিক ভুলের মাপকাঠিতে বেঁধে রাখে আমাদের। ভাষাকে 'স্বাভাবিক' ভেবে আমরা তাকে প্রশ্নাতীত করে নিই। অজান্তেই বলে চলি সেইসব কথা যা বললে সমাজ ঠিক যেই অবস্থানে আছে তার মধ্যেই রয়ে যাবে – বদলাবে না। রাজনীতির প্রাথমিক শর্তই তো পরিবর্তন। অথচ কথা বলা বা লেখার সময় খেয়াল করি না ভাষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চলনে (প্রবাদ-প্রবচন, ইঙ্গত, অভিব্যক্তি, লিঙ্গভেদ, গালিগালাজ) ক্ষমতার আশ্চর্য বিন্যাস।
>
> "পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ভাষার টান শিশ্ন কেন্দ্রিক – ক্রমাগত দৃঢ় করে তোলে ক্ষমতার ভিত। ভাষার সমস্ত উপাদান নারীকে পুরুষের অপর রূপে সংজ্ঞায়িত করে। ভাষার সমস্ত উপাদান সতত নারীবিদ্বেষী – বারবার লঙ্ঘন করে নারীর অস্তিত্ব।" - এখান থেকেই ভাষাকে অন্য স্রোতে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা করেন নারীবাদীরা। এখানে তাঁদের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে মূলস্রোতের সঙ্গে এযাবৎ চলে আসা শব্দাবলি।"[২]

অভিধানে 'পুরুষ' শব্দের সমার্থ শব্দ হিসাবে 'মানুষ' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও নারীর সমার্থ শব্দ হিসাবে 'মানুষ' শব্দটি উল্লিখিত হয় না। সুধীজন সমাদৃত এই অভিধান গুলিতে নারী-দের কে 'মানুষ' বা পুরুষের সমগোত্রীয় বলে গণ্য করা হয় না।[৩]

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে নারবাদী চিন্তা চেতনার বিস্তারর ঘটলেও, নারীর মর্যাদা কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে তা প্রশ্নাতীত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অবজ্ঞা করা হয় নারীকে। পরিবারকে কেন্দ্র করেই তারা জীবনাবর্ত করতে থাকে। এখানেও জায়গা করে নেয় গার্হস্থ্য হিংসা, অত্যাচার ও নারী বিদ্বেষী মনোভাব; উচ্চ-নিম্ন সমাজের সর্বস্তরে এই চেনা ছবি। বর্তমানকালে এসেও নারীবাদ নিয়ে চর্চা মূলত প্রাতিষ্ঠানিক, তা মূলত

বই-কেন্দ্রিক কিংবা শহরাঞ্চলের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সার্বজনিকভাবে নারীবাদের বিকাশ পৃথিবীর কোনো দেশেই ঘটেনি।

বাংলা সাহিত্যে বেগম রোকেয়া কিংবা মল্লিকা সেনগুপ্ত যে নারীবাদের চর্চা করে পুরুষতন্ত্রকে কটাক্ষ করেছিলেন, তাচ্ছিল্য করেছিলেন, তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যে তাই-ই পরিলক্ষিত হয়, তবে তা আরও তীব্র ক্রোধে উচ্চারণ করেছেন তসলিমা। সাহিত্যের আসরে কবিতা দিয়ে তাঁর পথচলা শুরু হলে ক্রমে তিনি বিতর্কিত হয়ে ওঠেন একশ্রেণীর পাঠকের কাছে। সরল ও সাবলীল ভাষায় রচিত তাঁর কাব্যগুলির বিষয় হয়েছে পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসন ও ধর্মীয় মৌলবাদ। তাঁর সাহিত্যে ক্রমশ জায়গা পেতে থাকে প্রান্তিক মানুষেরা, তৃতীয় লিঙ্গ ও নারীর সমানাধিকার বিষয়ক রচনা। তিনি লক্ষ করেছেন পুরুষতন্ত্র চায় নারীবাদকে বিকলাঙ্গ করতে, এখানে তাদের সহায়ক হয়ে ওঠে ধর্মগ্রন্থগুলি। যে যৌনতাকে অবলম্বন করে যুগ যুগ ধরে পুরুষেরা নারীর স্বাধীনতাহরণ করেছিল, সেই যৌনতার হাত ধরেই নারীর মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন তসলিমা। নারীবাদী মুক্তিচেতনার কথা আছে তাঁর কাব্যগুলির পরতে পরতে; "ইচ্ছে করে ছেলের কলার টেনে ড়িকশায় ওঠাতে - / পেটে-ঘাড়ে কাতুকুতু দিয়ে হাসাব / ঘরে এনে হিলওলা জুতোয় / বেধড়ক পিটিয়ে ছেড়ে দেব – যাশ্ শালা।" [বিপরীত খেলা]

২

একজন কবি অন্য কবির থেকে পৃথক হন কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে। কবিতার বিষয়কে আশ্রয় করে সৃষ্টি করতে হয় সৃজনশীল সাহিত্যের। বিষয় উপস্থাপন রীতির মধ্য দিয়েই কবি ও কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ হয়। একজন কবি তাঁর কবিতার বিষয়টিকে সার্থক ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে গেলে তাঁকেও রীতিদক্ষ হয়ে উঠতে হয়। এখানে তাঁর অবলম্বন হয় ছন্দ, অলংকার, উপমা, রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতি সহযোগে শব্দ ও শব্দবন্ধের বিন্যাসক্রম।

কবিতাকে শুধু প্রকাশিত হলেই চলে না তাকে প্রবেশ করতে হয় পাঠকের মনে, এখানেই নির্ভর করে কবি সাহিত্যিকদের প্রতিভা। এর জন্য কবিদের নানা কলা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় এবং ব্যাক্তিভেদে সেই কলাকৌশলের রূপও বদলে যায়। আর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই রবীন্দনাথের কবিতা থেকে জীবনানন্দের কবিতে চিনে নেওয়া কষ্টসাধ্য নয়। তসলিমা নাসরিনের কবিতার আঙ্গিক গঠনে প্রাধান্য পেয়েছে Orality বা মৌখিক কথন রীতি, কবিতার পংক্তিগুলি যেন গদ্যে বলে যাওয়া কথার সারি।

বিয়ের পর পুরুষের কাছে নারী-শরীর পরিণত হয় ভোগ্য বস্তুতে, তখন আর ব্যক্তি-আমি'র কোনো মূল্যবোধ থাকে না। যাবতীয় মূল্যবোধ নির্ধারণ করে প্রতিরাতে, সেই পুরুষ নারী-শরীর নিয়ে খেলা করতে থাকে। বিবাহ নামক সামাজিক প্রথাতে আবদ্ধ হওয়ার পর, মেয়েদের করুণ ও দুঃসহ জীবনের কথাই উঠে এসেছে 'নিয়তি' কবিতায়। লক্ষ্যনীয় হল, দৈনন্দিন জীবনের আনাচ-কানাচ থেকে উঠে আসা শব্দ চমৎকার ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে –

"উন্মাতাল চুমু খেতে খেতে
দু'হাতে মুঠো করে ধরে স্তন।" [নিয়তি]

এখানে 'উন্মাতাল' কথ্য ভাষাটি কবিতাটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। পুরুষ নারীরকে কেবল দেহের আধারে বিচার করে তাকে বলেছে 'মাল'।

"আপাদমস্তক তুমি এক ভন্ড, প্রতারক
তোমার লাম্পট্য সব জানি,
তবুও নিঃসঙ্গতার দোষে তোমার কাছে যাই,
বারবার কলুষিত হই
ঘোলা জলে ডুবে ডুবে কলঙ্ক লেপন করি নিটোল শরীরে
তোমার লাম্পট্য সর্বজন জানে
তবুও নিঃসঙ্গতার দোষে তোমারই দরজায় কড়া নাড়ি
লোকে একে ভুল করে ভালোবাসা ভাবে।" [নিঃসঙ্গতার দোষে]

এই সাহসী উচ্চারণ তসলিমা নাসরিনের কবিতায় সর্বত্র। 'প্রতারক', 'লাম্পট্য', 'কলুষিত', 'ঘোলা জলে' দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দবন্ধগুলি কবিতায় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে।

পুরুষতন্ত্রের চিরাচরিত ভোগ-লালসায় নারী বেশ্যায় পরিণত হয়। তাই 'বেশ্যা' শব্দটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ঘৃণার উপহার, এই সমাজই বাধ্য করে নারীকে একাধিক পুরুষের কাছে তার দেহ তুলে ধরতে। কিন্তু একজন নারীই কেবল বেশ্যায় পরিণত হয়, অথচ যে কারণে একজন নারীকে বেশ্যা বলা হয় সেই একই কারণে একজন পুরুষ কখনও 'বেশ্যা' হয় না;

"ওই দেখ বেশ্যা যায়
বেশ্যার শরীর অবিকল মানুষের মতো,
তবু মানুষ না বলে তাকে বেশ্যা বলা হয়।
বেশ্যারা সকলে নারী, কখনও পুরুষ হয় না। [বেশ্যা যায়]

উত্তম পুরুষের জবানীতে গল্প বলার ভঙ্গিতে রচিত এ কবিতায় লেখিকা আমাদের চলে আসা চিরাচরিত মূল্যবোধকে এভাবেই অব্যক্ত কিছু প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন।

লড়াই অথবা সংগ্রামে নারী অনেক বেশি সচেতন। কোনো কোমল বিশ্বাস তার চলার পথকে নাড়িয়ে দিতে পারে না। সবরকম বিশ্বাস থেকে সরে এসে তাই তসলিমা বলতে পারেন;

"কিছুটা কায়দা করে রমণীকে ভোগ না হলে
সে ভোগে তৃপ্তি নেই, তৃপ্তির সুগন্ধি ঢেকুর নেই।
আর আমি তা জানি বলেই
আমার এই শরীর থুতু ফেলার আগে
অন্তত দুবার থুতু ফেলি তোমার কুচরিত্র মনে।" [বনিতা বিলাস]

পুরুষতন্ত্রের দ্বি-চারিতা স্থূলতার প্রতি কবির বিক্ষোভ সোচ্চার হয়েছে, নানান বিরূপ শাব্দিক ব্যবহারে নারীর অসন্তোষ ও ঘৃণা সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে – 'তৃপ্তির সুগন্ধি ঢেকুর', 'থুতু ফেলি তোমার কুচরিত্র মনে' প্রভৃতি শব্দবন্ধের দ্বারা।

'নারীরা পারে না' কবিতায় নারী এবং পুরুষের ভালোবাসার স্বরূপ ও পার্থক্য চিত্রিত হয়েছে। পুরুষের ভালোবাসার শরীর কেন্দ্রিক ও যে কোনো নারীর সাথে অবলীলায় মিশে যেতে পারে -

"যে কোনও পুরুষ নির্দ্বিধায় পারে
যে কোনও নারীর মেদমাংস ছুঁয়ে ছেনে হরষিত হতে।"

অন্যদিকে নারীর ভালোবাসা অশরীরী, সে মন থেকে কাউকে গ্রহণ করতে না পারলে শারীরিক ভাবেও গ্রহণ করতে পারে না;

"ভালোবাসা ছাড়া কোনও মাংসের শরীর ছুঁতে
পারঙ্গম জন্তু ও পুরুষ
নারী নয়।"

'মেদমাংস', 'আবেগের ঋতু', 'ঘ্রাণ শুঁকে নিতে', 'আঙুলের স্পর্শ' শব্দবন্ধগুলি পুরুষের যৌনলালসাকেই ইঙ্গিত করে, আর তাই নারীবাদী কবির কাছে পুরুষ ও 'জন্তু' সমার্থক হয়ে গেছে।

তসলিমার নারীকেন্দ্রিক কবিতাগুলি নারীবাদী সংগ্রামের এক একটি দলিল হয়ে উঠেছে। শরীর থেকে মনকে কার্যত তিনি আলাদা করে দেখতে সচেষ্ট। সে ক্ষেত্রে শরীরের খেলাকে কেবল শারীরিক সীমাতেই নারী আটকে রাখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে –

"শরীর দেব শরীর খুলে জৈব খেলা হোক
সৌর থেকে জগৎ তুলে তাদের হাতে দেব
তবু আমার মন দেব না অমূল্য এ মন
যাকে আমার ইচ্ছে করে কেবল তাকে ছাড়া।" [সোনার শিকল]

'কিছু না কিছু' কবিতায় পুরুষের চোখে নারী কতরকম ভাবে উপস্থাপিত হয় তারই চেনা ছবির বর্ণনা পাই আমরা – 'পেটুক পুরুষ' এই গুণবাচক বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয়েছে পুরুষের স্থূলতা বোঝাতে। একই সাথে নারীকে তুলনা করা হয়েছে বস্তুবাচক বিশেষ্য 'গরুর মাংস', 'আমের মোরব্বা', 'দুধের সন্দেশ' দ্বারা।

এই কবিতারই পরবর্তী পরিচ্ছেদে পুরুষকে তুলনা করা হয়েছে ‘অসুস্থ পুরুষ’, ‘ধর্মান্ধ পুরুষ’ প্রভৃতি গুণবাচক বিশেষ্যের প্রয়োগে।

৩

কবিতায় সমান্তরালতার সঙ্গে পুনরুক্তিকে এক করে দেখা উচিত হবে না। সমান্তরালতার মধ্যে পুনরুক্ত পদ, পদগুচ্ছ বা বাক্য থাকতে পারে কিন্তু সবটা মিলিয়ে দেখলে তা পুনরুক্তি নয় – সমান্তরাল। কিন্তু নিছক পুনরুক্তিকে সমান্তরাল বলা ঠিক হবে না। আমরা সমান্তরালতার মধ্যে বিন্যাসের বিস্তার লক্ষ করি। এই বিস্তার কাজ করে প্রধানত দু’ভাবে। ক. আলঙ্কারিক বিস্তার খ. বিষয়গত বিস্তার।[৪] তসলিমার কবিতায় সমান্তরালতা মূলত বিষয়গত। অলঙ্কারিক কাব্য সৌন্দর্য্যকে তিনি বর্জন করেছেন।

‘বেঁচে থাকা এর নাম’ কবিতায় তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য সংগ্রামের বর্ণনা পাই। তসলিমার কবিতায় বারবার জায়গা পায় দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষ, তাদের কথাই এখানে স্থান পেয়েছে। এই নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেঁচে থাকার কথা বলতে গিয়ে কবি একাধিক উপমা ও রূপকের ব্যবহার করেছেন। কবিতার প্রথম বাক্য তপ্ত ‘চৈত্রের মধ্যাহ্ন বেলা’ থেকেই বোঝা যায় প্রতিকূল প্রকৃতির দৃশ্য সেখানে পুড়ে খাক হয়ে যায় প্রকৃতি ও মানুষ। ক্রমশ দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন-যাপন, চৈত্রের মধ্যাহ্ন বেলা যেন গরম আগুনের চুল্লি, অথচ ভগবান ব্যস্ত তাঁর সাত আসমানের বিলাসী জীবন নিয়ে। কবিতার প্রথম স্তবকেই এক আশ্চর্য বৈপরীত্য দেখা যায়। পরবর্তী স্তবকে ‘শ্রমের জীবন যায়’, ‘বিনিদ্র রজনী যায়’, ‘আমাদের সাদা ভাতে অশুচি দেয় দাঁতাল শুয়োর’, ‘নিসর্গেও বান আসে’ শব্দবন্ধগুলি তে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের বেঁচে থাকার কথা বলে; যা অর্থগত দিক দিয়ে কবিতার নামেরই প্রতিধ্বনি। সুতরাং, উক্ত শব্দগুচ্ছ ও পদগুলি কবিতায় সমান্তরালতাতার সৃষ্টি করেছে।

‘নির্বাসন ২’ তিন স্তবকের এই কবিতায় কবিতার শুরু হয়েছে নেচিবাচকতা দিয়ে। চার পংক্তির প্রথম স্তবকে নেতিবাচকতা যুক্ত পংক্তিগুলি হল –

এক, ‘পৃথিবী আঁধার করে ফিরে যায় অমল রোদ্দুর’
দুই, ‘পেছনে কালিমা রেখে ফিরে যায় সবুজ সুষমা’
তিন, ‘শিকার খুবলে ফিরে যায় চতুর শৃগাল’

এখানে লক্ষণীয় হল, তিনটি বাক্যেই ‘ফিরে যাওয়া’ নেতিবাচকতার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু তৃতীয় বাক্যে যখন কবি বলেন, ‘শিকার খুবলে ফিরে যায় চতুর শৃগাল’ কিন্তু; লম্পট জুয়ারি ঘরে ফেরে কারণ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল সে অমানুষ ও ‘মদ্যপ শকুন’। নারীও পুরুষের থেকে সমান ভালোবাসার দাবি রাখে। যে প্রেমিক লেখিকার জীবনের ‘পরাণের রোদ’ সে যখন লেখিকাকে ছেড়ে যায় তখন তাঁর কাছে ‘নির্বাসন’ আরও বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই পুরুষের যাবতীয় বীরত্বের প্রকাশ পায় নারীর সামনে; নারী শরীর ব্যবহার করে যে পুরুষ গৃহ প্রত্যাক্ষাণ করে সেই পুরুষই আবার গৃহে ফেরে উত্তাল জোয়ারের বিষণ্ণতা দেখে। দ্বিতীয় স্তবকে একদিকে, পুরুষের প্রতি নারীর আকাঙ্ক্ষা ও অবমাননার দিক আছে; অন্যদিকে, পুরুষের কাপুরুষতার দিকের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। তৃতীয় স্তবকে পূর্ব উল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গে বৈপরীত্য দেখা যায় যখন কবি তাঁর প্রেমিক নয় বরং ‘নির্বাসিত’ জীবনকেই বেছে নিতে চান;

> “একফোঁটা জ্যোস্না নেই, সেই ভাল, নিকষ আন্ধার
> অমাবস্যা ডুবে থাক, তবু রোদ খুঁজো না সকাল।”

‘আমার কিছু যায় আসে না’ কাব্যের ‘অবতরণ’ কবিতায় একজন মেয়ের অবতরণের কথা বর্ণিত হয়েছে। ‘সমাজের জেব্রাক্রসিং’ একজন প্রতিবাদচেতনাধর্মী মেয়েকে জাঁতাকলে বদ্ধ করে রাখতে চায়। পুরুষ সর্বস্ব সমাজ কীভাবে নারীকে ক্লিষ্ট করে তার সমার্থক পংক্তিগুলিতে লেখিকার তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার প্রমাণ মেলে। সামগ্রিকভাবে এখানে প্রতিবাদধর্মী মেয়েদের কথা উল্লেখ করেছেন তসলিমা, যারা পুরুষের তৈরি সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের বিভেদ আনতে চায়। কিন্তু সেই মেয়েরাও শেষ পর্যন্ত পুরুষের তৈরি সামাজিক বিধানে আবদ্ধ হয়ে যায়। অবশেষে তারা ফিরে আসা চিরাচরিত পারিবারিক জীবনে, যেখানে তারা শিকার হয় গার্হস্থ্য হিংসার আর বেছে নিতে বাধ্য হয়; ‘আলনা গোছানো’, ‘পায়েসে শখ করে দিতে চায় দু’-তিনটে লবঙ্গ এলাচ’ কিংবা ‘দু’ভরি অনন্ত বালা’। এ-কবিতার প্রথম ও মূল বাক্য হল – “একটি রমণী শেষঅব্দি রমণী থেকে যায়।”

নারী অবতরণের যে কারণগুলি দেখিয়েছেন তসলিমা, তা প্রথম পংক্তিকে প্রবলভাবে সমর্থন করে, এবং যা বাস্তবিক সত্য।

এক, "রাস্তায় মানুষ সমস্বরে সিটি দেয়,"
দুই, "দু'-একটা লকলকে জিভের কুকুর ঠিক পিছন পিছন চলে।"
তিন, "তখন সে ক্রুদ্ধ, ক্ষোভে প্রায়োন্মত্ত / বিশ নখে আঁচড়ায় সামাজিক দোষত্রুটি,"
চার, "একদিন নিষেধের বরফে ডুবিয়ে তার সমস্ত আগুন / সেও পোষ মানে।"

বৈপরীত্য তসলিমা নাসরিনের কবিতায় একটি অতি ব্যবহৃত রীতি, যা কবিতার গঠন ও অর্থের মধ্যে টানাপোড়েনের সৃষ্টি করেছে। নারীবাদী লেখিকা পুরুষ শাসিত সমাজে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কলম ধরেছেন, তাই তিনি চিরাচরিত প্রথাগুলিকে ভাঙতে চেয়েছেন যার ফলে তাঁর কবিতায় বারবার বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

'নির্বাসিত নারীর কবিতা' কাব্যের 'পুরুষের বিশ্ববিজয়' কবিতায় স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী পাবলো পিকাসোর বাল্যকালের চিত্রকর্মগুলি 'মুইজিও পিকাসো'তে সংগৃহীত আছে। তসলিমা লক্ষ করেছেন চিত্রশিল্পের প্রতিভার পাশাপাশি পিকাসো ভালোবাসতেন 'মেয়েমানুষ', কুকুর আর বুল ফাইট। উল্লেখ্য 'মেয়েমানুষ' ও কুকুর দুই'ই ছিল পিকাসোর বিলাসিতার অঙ্গ। লেখিকারও ইচ্ছে জাগে; "পুরুষ আর কুকুর নিয়ে খেলতে"। কিন্তু তিনি জানেন, "পিকাসোর চেয়ে ভাল আঁকলেও ছবি, লোকে বলবে – ছি ছি।" আসলে 'পুরুষের বিশ্ববিজয়' কবিতায় তসলিমা বলতে চেয়েছেন পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন, তার প্রতিভা থাকলেই সে ক্ষ্যাতি লাভ করে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিভার পাশাপাশি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বিচার করা হয়। আলোচ্য কবিতায় পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বিচারিতার কথা উল্লেখ করে তসলিমা কবিতায় বৈপরীত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

ইউরোপের দেশগুলিতে দিনযাপনে তসলিমা লক্ষ করেছিলেন প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা। দীর্ঘ শীতের পর বসন্তকালের আগ্রহ নিয়ে কালাতিপাত করা সুইডেনের মানুষেরা যখন ঝকঝকে রোদের মধ্যেও বরফের ঝড় দেখেন তখন স্বপচূর্ণ হয় তাঁদের। তাঁরা 'শীতে কুঁকড়ে' থাকার পর তাঁরা প্রত্যাশা করেন গাছে গাছে ফুল ফুটবে, বাল্টিকের তীরে শুয়ে রোদ পোহাবেন যুবক-যুবতীরা। কিন্তু তাঁদের 'স্বপ্নের গালে চড়' মেরে তাবৎ দেশ ঢেকে যায় বরফে। এই ঘটনার সাথে তসলিমা উপলব্ধি করেছেন ব্যাক্তিগত অনুভূতির বৈপরীত্য, তাঁর মনে হয়েছে;

> "তুমিও অনেকটা এপ্রিলের বসন্ত, আসছ বলে আসো না,
> ভালবাসছ বলেও বাসো না, হঠাৎ আসো, ভালবাসো, আবার কাঁদিয়ে ভাসিয়ে
> আচমকা চলে যাও।" [এপ্রিলেও বরফের ঝড়]

৪

ফরাসী প্রতীকী কবি গোষ্ঠীদের অনুসরণে Imagist Movement বা চিত্রকল্পী আন্দোলনের জন্ম। চিত্রকল্পকে সবসময় দৃশ্যমান হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দৃশ্যমানতা চিত্রকল্পের সবচেয়ে বড় গুণ হলেও চিত্রকল্পকে সবসময় প্রকটভাবে দৃশ্যমান হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধ্যকতা নেই। মানুষের অন্তরের চিন্তা-চেতনা যখন ভাবানুভূতির বর্ণবৈচিত্র্যে যথোপযুক্ত শব্দবিন্যাসে সুবিন্যস্তভাবে চিত্রে ও ছন্দ বিন্যাসে উপস্থাপিত হয় তখনই সে হয়ে ওঠে কবিতা। সুতরাং, চিত্রকল্প প্রয়োগের জন্য কবিকে কাব্যমধ্যে শব্দ এমনভাবে ব্যবহৃত করতে হবে যাতে পাঠকের কল্পনালোকে ঐ শব্দগুলি চিত্রিত সৌন্দর্য উন্মুক্ত করবে। কারণ, কবিতার মূল উপজীব্য বুদ্ধি বা হৃদয় নয় তার শক্তিশালী কল্পনা। আপাতভাবে দু'টি বিসদৃশ্য বস্তু বা উপাদানকে একসঙ্গে স্তবকায়িত করে নতুন সম্পর্ক উদ্ভাসিত করায় পাঠকের মনে, বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে চিহ্নিত হয় নতুন সম্পর্ক। দু'টি বা একাধিক বিসদৃশ্য বস্তুর মধ্যে সফল ভাবে মিলন ঘটিয়ে নতুন কোনো গুঢ় চিন্তার জন্ম দেওয়াই হল চিত্রকল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য।[৫]

তসলিমার প্রথম কাব্য 'শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা'তে অপরিণত লেখা লক্ষ করা গেলেও এখান থেকেই তাঁর কাব্যিক পথ চলার রূপটি স্পষ্ট হয়ে যায়। সদ্য যৌবনত্তীর্ণ কবির কাব্য রচনার পিছনে বিশেষ কোনো প্রভাব কাজ করেনি বরং দৈনন্দিন নারী-জীবনের অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় সচেতনতা থেকেই কবিতাগুলি রচনা করেছেন।

'চাই বিশুদ্ধ বাতাস' কবিতার নামকরণেই স্পষ্ট হয়ে যায় কবিতার বিষয়বস্তু। পরাধীন বাংলাদেশে বিষাদময় দিনের বর্ণনা পাই আলোচ্য কবিতায়।

"বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ, পাখির কুজন নাকি কেউ কেউ পায়
লাশের চৌদিক জুড়ে আমি শুধু শকুনের হর্ষধ্বনি শুনি
বুট ও বুলেট সহ জলপাই রঙের ট্রাক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে
এক দুই তিন করে সহস্র লাশের গন্ধ সংগোপনে গুনি।" [চাই বিশুদ্ধ বাতাস]

স্বাধীনতা অন্দোলনরত বাংলাদেশের যে বিভৎসতা তসলিমা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার বর্ণনা পাই 'আমার মেয়েবেলা' গ্রন্থে। উল্লিখিত স্তবকে 'বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ' থেকে 'সহস্র লাশের গন্ধ সংগোপনে গুনি' পর্যন্ত সমসাময়িক বাংলাদেশের বাস্তব ছবির অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন কবি। সামাজিক প্রতিকুল পরিবেশ কেউবা এড়িয়ে চলতে পারেন কিন্তু চিত্ত-সচেতন কবির পক্ষে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পরবর্তী দুই স্তবকে শস্য শ্যামলিত দেশে পরাধীনতা থেকে মুক্তির বাসনা দেখতে পাই আমরা। কিন্তু যুদ্ধ দুর্বিগ্রস্তত বাংলাদেশে "কোথাও নেই নিশ্বাসের হাওয়া / কন্ঠনালী চেপে আছে লোমশ নৃশংস হাত, কালো এক হাত" – এই হাত ছিঁড়েফুঁড়েই কবি বিশুদ্ধ বাতাসটুকু পেতে চেয়েছেন। 'কালো, লোমশ', 'নৃশংস' শব্দগুলি স্বাধীনতার প্রতিকুল, রাষ্ট্র ও পুরুষতান্ত্রিকতার আধিপত্যের দিকটিকেই চিহ্নিত করে।

বয়ঃসন্ধিক্ষণে পুরুষের মতো নারীরও দেহ মনে জাগে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা, সেখানে সে পুরুষের থেকে পিছপা হতে চায় না; বরং ভালোবাসার সমান দাবি রাখে। নারীর বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক অভিপ্রায়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'তৃষ্ণার্ত আমাকে' কবিতায়। একের পর এক শব্দগুচ্ছের ব্যবহার এখানে লক্ষণীয়। এক, "গোলাপের গন্ধে শরীরে শরীর ডুবিয়ে মাছ মাছ খেলব দু'জন।" দুই, "বড় বেশি সাধ জাগে কুমারী শরীরে মাখি রক্তবর্ণ দাগ / জগৎ সংসার ফেলে একবার ছুঁয়ে দেখি অসহ্য সুন্দর।" তরুণ বয়সে জগত-সংসার নিয়ে একপ্রকার রোমাঞ্চ দেখা গেছে এই পর্যায়ের কবিতাতে আর স্থান পেয়েছে দেহ-কেন্দ্রিকতা।

বিবাহের মতো আত্মিক সম্পর্কের মধ্যেও পুরুষ তার স্ত্রীর ওপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চায়। নিজের জীবনে মরমে মরমে অনুভব করেছেন তসলিমা। তাঁর 'শুভ বিবাহ' নামক কবিতাটির শুরুতেই পুরুষের প্রভুত্ব কায়েম করার দিকটি তুলে ধরতে বাকপ্রতিমার প্রয়োগ করেছেন।

"আমার জীবন
চর দখলের মতো দখল করেছে এক বিকট পুরুষ।"

কবিতার মধ্যে ক্রমানুযায়ী একজন স্বামীর স্ত্রীর প্রতি যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া, ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিবরণ। এই দায়ভারই সমাজ-সংসারে নারীর উপজীব্য হয়ে ওঠে। এখানেই পুরুষের চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ হয় না; অবশেষে সে তার স্ত্রীর থেকে প্রত্যাশা করে, শুধু শারীরিক ভাবেই নয় মানসিক ভাবেও তার স্ত্রী যেন আত্মবিসর্জন দেয়। কবিতার শেষ চরণগুলিতে পুরুষের প্রেমে প্রত্যাক্ষিত নারীর জীবন গাথা বাকপ্রতিমায় প্রকাশিত হয়েছে।

"যেন তাকে ভালবেসে গলে যাই মোমের মতো
কোনও পুরুষের দিকে দু'চোখ না তুলে
আজীবন যেন দিই সতীত্ব প্রমাণ।
যেন তাকে ভালবেসে
কোনও এক জ্যোস্না রাতে বিষম আবেগে আমি আত্মহত্যা করি।" [শুভ বিবাহ]

এযাবৎ চিরাচরিত প্রেমের কবিতায় আমরা দেখেছি প্রেমিকার প্রতি পুরুষের প্রেম নিবেদন। তসলিমার কবিতায় বৈপরীত্য এখানেই যে এক নারী প্রেম নিবেদন করেছে প্রেমিকের প্রতি। অভিসারীণি প্রেমিকা শুধুমাত্র ভালবাসার প্রস্তাব নয়, বরং ক্ষণিকের তরে হলেও ছুঁইয়ে দেখতে চান তাঁর ভালবাসার মানুষটিকে। বলা বাহুল্য, জীবনানন্দের কবিতায় যে রূপ-রস-দৃশ্যের দেখা আমরা পায়, আলোচ্য কবিতায় এই দৃশ্যময়তার দেখা মেলে। লেখিকা যখন বলেন, "নিসর্গের অমসৃণ মই বেয়ে / নক্ষত্র ছোঁবার মতো করে আকাশে তোমাকে ছোঁব," তখন

আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না এক নারীর বকলমে আর এক নারী যখন প্রেমের কবিতা লিখছেন সে কবিতা একান্ত ভাবেই বিলাসী প্রেমের বর্ণনা।

"সারারাত পূর্ণিমার জলে ভিজে ভিজে
তোমাকে স্পর্শের জন্য
পাড়ি দেব আমার জীবন।" [স্পর্শ]

আলোচ্য কবিতায় যাকে 'স্পর্শ' করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন লেখিকা সে হবে প্রেমিক আদর্শ। যে তাঁকে চালিত করবে জীবন থেকে জীবনান্তরে। ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী'' কাব্যের কবিতাগুলিতে দেখা পায় 'আদর্শ নারীর'। যে বা যারা কবিকে পরিচালিত করে, কবিতা লিখতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। অনুরূপভাবে তসলিমাও এখানে 'আদর্শ প্রেমিকের' স্পর্শের প্রত্যাশা করেছেন।

চিত্রকল্পের ব্যবহারে নারী জীবনের সার্বিক জীবন যন্ত্রণার ইমেজ কে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন কবি। তিনি যখন বলেন "গাছ গুলো বুড়ি বেশ্যার মতো ন্যাংটো'', তখন আমরা বুঝে নিতে পারি বাংলা সাহিত্যে এমন চিত্রকল্পের ব্যবহার সত্যিই অভাবনীয় ও বিরল।

৫

তসলিমা নাসরিনের কবিতার ভাষা গঠনে আর কয়েকটি বিষয় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে তা হল পদ ব্যবহারের রীতি, কাব্যিক সমাস ও ক্রিয়াপদের অভিনবত্ব। কবিতার ক্ষেত্রে এমন কিছু পদের ব্যবহার হয় যার প্রচলন গদ্যে হয় না। যেমন, অর্থের ঘনত্বকে প্রাধান্য দিতে তসলিমার কবিতায় ধন্যাত্মক অব্যয়ের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়; 'মিছিল' কবিতায় - "তাই তো এমন খাঁ খাঁ করে শুকনো জীবন / তাই তো এমন হুহু করে শুন্য হৃদয়।"

গদ্যের ভাষা থেকে কাব্যের ভাষাকে পৃথক করতে কাব্যিক সমাসের ব্যবহারও আধুনিক বাংলা কবিতা তথা তসলিমার কবিতায় দেখা যায়। যেমন, 'কাঁপন ১' কবিতায়; "তিরিশে নাকি কমতে থাকে ভালবাসার শীত / আমার দেখি তিরিশোর্ধ শরীর বিপরীত।"

ক্রিয়াপদ ব্যবহারে অভিনবত্ব দেখা যায় তসলিমার কবিতায় তাঁর অধিকাংশ কবিতার ক্রিয়াপদ লক্ষ করলে দেখা যাবে তাদের বক্তব্য বিষয়ের যাত্রা ভবিষ্যৎ কালের দিকে। যেমন, 'মসজিদ মন্দির' কবিতায় তসলিমা চেয়েছেন; "গুঁড়ো হয়ে যাক ধর্মের দালান কোঠা / ধর্মের অপর নাম আজ থেকে মনুষ্যত্ব হোক।" ধর্ম- কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মসজিদ, মন্দির, গুরুদুয়ার ও গির্জাগুলি মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। ধর্মীয় মৌলবাদ কখনই মানুষকে মৈত্রী ও সংহতির বাণী শোনায় না; উপরন্তু, মানুষকে মধ্যযুগীয় গোঁড়ামির দিকেই পরিচালিত করে। তাই সমাজ সচেতন, বিজ্ঞানমনস্ক লেখিকা বিশ্বাস করেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের পাঠ বিদ্যালয় ও পাঠাগারগুলিতে।

পুরুষতান্ত্রিক সাহিত্য ও সমাজব্যবস্থা এ-দু'য়ের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তসলিমা নাসরিনের সাহিত্যচর্চার ধারা ও পথ চলা। তিনি চান না আজকের দিনে কোনো নারী তার জীবনের ভার দিক কোনো পুরুষের কাঁধে, বরং সে নিজেই যেন পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। নিজেই রচনা করুক নিজের জীবন ইতিহাস। তার শারীরিক-মানসিক, ভালোলাগার যন্ত্রণার প্রস্তাবনা যেন নারী নিজেই রচনা করে। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার সাধারণ মেয়ে না হয়ে 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণাল হবার পরামর্শ দিয়েছেন। তসলিমা নিজে তাঁর জীবনের যন্ত্রণাগুলোকে উপলব্ধি করেছেন আর ক্রমশই তিনি প্রতিবাদ করেছেন, অবিরত থেকেছে তাঁর প্রতিবাদী সত্ত্বা। নারীবাদকে মূলস্রোতের জ্ঞানচর্চার নিয়ে যেতেই তিনি বারবার কলম ধরেছেন। কারণ আমাদের শিল্প-সাহিত্যের ভাষা যুগ যুগ ধরে পুরুষকেন্দ্রিক, এই প্রভাব কাটিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন নারীর নিজের ভাষা, যাতে সহজে ও অনায়সে নিজের বক্তব্য প্রকাশিত হবে। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা নারী চেতনার সার্থক দলিল হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র 'বিলাসী' সাহিত্য রচনা নয় তাঁর কবিতা রচনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা লিঙ্গবৈষম্য ও নারী নিষ্পেষণ। তাই, তসলিমার কবিতায় নিসর্গের তুলনায় প্রত্যক্ষ বাস্তবতা বেশি, এভাবেই তসলিমা নাসরিনের কবিতা হয়ে উঠেছে নারীর জীবন জিজ্ঞাসার দলিল ও নারীর নিজস্ব প্রস্তাবনা।

টীকা ও তথ্যসূত্রঃ

১. সুতপা ভট্টাচার্য, *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য,* সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, ২০১৪, পৃ.৭
২. ঋতু সেন চৌধুরী, *নারীবাদের নানা পাঠ,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১, পৃ.৮-৯
৩. তসলিমা নাসরিন, *নির্বাচিত কলাম,* , আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃ.৭৭-৭৮।
৪. সম্মা. অঞ্জন সেন ও উদয় নারায়ণ সিংহ, *কবিতার ভাষা,* দ্র. উদয় কুমার চক্রবর্তী, ‘‘আন্বয়িক গঠন, বিস্তার’’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, পৃ.১০৭
৫. দ্র. ভূমিকা, বিপ্রদাস বরুয়া, *কবিতায় বাকপ্রতিমা,* স্বাধীন বাংলা পরিষদ, ঢাকা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

আকর গ্রন্থঃ

১. তসলিমা নাসরিন, *কবিতাসমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬
২. তসলিমা নাসরিন, *আমার মেয়েবেলা,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৯৯
৩. তসলিমা নাসরিন, *নির্বাচিত কলাম,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯২
৪. তসলিমা নাসরিন, *উতল হাওয়া,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৯৯
৫. তসলিমা নাসরিন, *আমি ভালো নেই, তুমি ভালো থেকো প্রিয় দেশ,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০৬
৬. তসলিমা নাসরিন, *নেই, কিছু নেই,* পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১০
৭. তসলিমা নাসরিন, ‘নির্বাসন’, পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০১২

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. তরুণ মুখোপাধ্যায়, *ওপার বাংলার কবিতা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৭
২. সম্পা. বাবুল হোসেন, *আধুনিক বাংলা কবিতার পালাবদল,* দ্র. মৃদুল দত্তরায়, “তসলিমা নাসরিনের কবিতাঃ নারীর ‘গোল্লাছুট’-এর বহুমাত্রিক জীবন দর্শন”, দে’জ, কলকাতা, ২০১২
৩. রূপা ভট্টাচার্য, *মেয়েদের কবিতা : আরেক পৃথিবী,* কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৩

ইংরেজি সহায়ক গ্রন্থঃ

1. Lewis, C. Day. *The Poetic Image*. Kolkata: Books Way, 2008
2. Murray, Penelope, and T.S. Dorsch. *Classical Literary Criticism*. London: Penguin Classics, 1965